সম্পর্ক

শক্তিপদ রাজগুরু

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ভবদেব বাবু স্কুলের পুরোনো শিক্ষক। এই নবাসন গ্রামের জুনিয়ার স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম। ভূপতি চক্রবর্তী, সুদীপ নাথ — গণপতি দত্ত এরা আজ কেউই নাই। একা ভবদেবই রয়েছে এখনও অতীতের সেই স্মৃতি বুকে নিয়ে।

গ্রামের বাইরে মোহন্তদের আমবাগান। তারপরই লাল তাম্রাভ প্রান্তর কাছিমের পিঠের মত সোজা গিয়ে মিশেছে শালবনের সীমান্তে। ওই প্রান্তরে ঘাসও জন্মায় না। রুক্ষ বন্ধ্যা প্রান্তর।

আশপাশের কয়েকখানা গ্রামের মধ্যে স্কুলের বালাই তখন ছিল না। একটা খড়ের চালের লম্বা ঘর ছিল বাগানের বাইরে। সেখানে কিছু ছেলে আসতো। ভবদেববাবু তখন সবে বি-এ পাশ করেছেন। বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভালোই।

চাষের জমিও রয়েছে দুখানা হালের, ঘরে বড় বড় গোটা চারেক ধানের মরাই, গোয়ালে গরু মোষও রয়েছে। তাছাড়া পৈতৃক কিছু শালবন আর আশপাশের গ্রামে কিছু ধান সাজাও পেতো তারা, কয়েকশো মন ধান, বাবাও বেঁচে। সংসারে অভাব ছিল না।

ভবদেবও মনে মনে ছিল গান্ধিবাদী।

তখন ইংরেজ শাসনের কালের শেষ দিক। ভূত যখন ছাড়ে তখন নাকি সে শেষ কামড় দিয়ে যায়।

ইংরেজের অত্যাচারও তাই তখন চরমে উঠেছে। শাসন-শোষণও চলেছে জোর কদমে। গান্ধিজি অন্য নেতাদেরও জেলে পাঠানো হচ্ছে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ভবদেবের যোগ ছিল না। কিন্তু সমাজসেবার কাজকে সে পছন্দ করতো বেশি।

মানুষের জন্য কিছু দরকার। আর তাই ভবদেব ভেবেছিল শিক্ষাদানই করতে চেষ্টা করবে সে। তাই এই খড়ের চালার মাইনর স্কুলটাকে নিয়েই পড়ে ভবদেব।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষদেরও সচেতন করে, শিক্ষার প্রসার করতেই হবে। সাধারণ মানুষ, এ গ্রাম-সে গ্রামের কিছু মানুষ সাধ্যমত সাহায্য করতে থাকে।

সুদেব ভূপতি চক্রবর্তী আরও অনেকে ভবদেবের পাশে এসে দাঁড়ায়। ক্রমশ জরাজীর্ণ মাটির ঘরটার রূপ বদলায়। আরও ছেলেরা আসতে থাকে।

ভবদেববাবুও দিনরাত স্কুলের পিছনেই রয়েছেন। তখন ভবদেবের বিয়ে হয়েছে। ভবদেবের স্ত্রী সুলোচনাও দেখেছে স্বামীর ওই কাজের নেশাটাকে। সুলোচনাও বাধা দেয় না। বরং সেও বলে মেয়েদেরও পড়ার ব্যবস্থা করো বাপু।

ভবদেব বলে— নিশ্চয়ই হবে।

সেও স্ত্রীর কথায় খুশিই হয়। আর পাঁচজন গ্রামের বৌদের মত সুলোচনা সংসার আর নিজেকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চায় না। সেও চায় কিছু কাজ করতে।

শহরের মেয়ে সে। কলেজেও পড়েছিল, এখন গ্রামে এসে তার অধীত বিদ্যাকেও সে কাজে লাগাতে চায়। তাই ভবদেবকে সে বাধা দেয় না বরং সুলোচনাও মেয়েদের শিক্ষার কাজে সাহায্য করতে চায়।

নবাসন গ্রামের জুনিয়ার স্কুল ক্রমশ ধাপে ধাপে এবার উন্নীত হতে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যে গড়ে উঠলো নতুন স্কুল বাড়ি। ভবদেব সদর শহর থেকে কলকাতা অবধি দৌড় ঝাঁপ করে নানান জনকে ধরে নবাসন জুনিয়ার স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করলো।

সেই সঙ্গে চালু হলো এই গ্রাম — আশপাশের গ্রামের মেয়েদের নিয়ে সকালে মর্নিং সেকশনও।

প্রথমে অনেক অভিভাবকই মেয়েদের মাঠের পথে ভিন্নগ্রামে গিয়ে পড়াশোনায় আপত্তিই জানায়। তারা বলে

— মেয়ে বড় হলে পরের সংসারে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলবে — কী হবে তাদেরকে গাঁ কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়ে। গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলে যা শিখেছে তাই ঢের।

অনেকে আবার অন্তঃপুরের শুচিতার কথাও তোলে। সে গাঁয়ের গোস্বামী মশায় টিকি নেড়ে নাকে এক টিপ নস্যি গুঁজে বলে— এ অনাচার, অশাস্ত্রীয় ব্যাপার হে। ঘোর কলি। নাহলে মেয়েদের বেরুতে হবে ওই সবের জন্য। ঘরের শুচিতার প্রশ্ন।

সুলোচনা কিন্তু দমে না।

তখন তার বড় ছেলে কাঞ্চন বছর পাঁচেকের। ছোট ছেলে রতনও বছর খানেকের। সংসার সামলে, ছেলেদের দেখাশোনা করে সে স্কুলে যায়। দরকার হলে এ গাঁ — সে গাঁয়েও যায়।

তাকে দেখে বাড়ির গিন্নিরা বলে,

— বৌমা তো ঘর-সংসার, শাশুড়ির সেবা করেও এসব করছে। আর মেয়েদের কি চিরকাল ঘরের মধ্যেই আটকে রাখবে? অনেকেই স্বীকার করে।

— দিন বদলাচ্ছে। মেয়েদেরও এবার লেখাপড়া না শিখলে বিয়ে থাও ভালো ঘরে হবে না।

এটা বুঝেই তারাই মেয়েদেরও স্কুলে পাঠাতে থাকে। ক্রমশ গার্লস স্কুলও গড়ে ওঠে। বয়েজ স্কুল এখন এদিকের নামী স্কুল।

অনেকগুলো বছর কেটে গেছে তারপর।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। সমাজের রূপটাও বদলেছে। এখন ভবদেববাবুর বয়স হয়েছে। স্কুলের মধ্যে সেই প্রাধান্য এখন তার নাই। কারণ এখন স্কুলের বিশাল বিলডিং — ??।

স্কুলের হেডমাস্টার বিজয়বাবু বাইরের মানুষ, ডবল এম.এ, বি.টি। স্কুলে এখন এম.এ, এম.এস.সির ছড়াছড়ি। তাই সেকেলে বি.এ., বি.টি ভবদেববাবু তাদের চাপে এখন অনেক নীচেই পড়ে রয়েছে, সাধারণ শিক্ষক হিসাবে।

এই স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও এই কথাটা এখন গল্পকথায় পরিণত হয়েছে।

অবশ্য ভবদেববাবু এখনও স্কুল কমিটিতে রয়েছে। কিন্তু ভবদেবও জানে ওটা নামেই। এখন গ্রামের মানুষ গুলোও ক'বছরেই বদলে গেছে। সেখানে ভবদেবের কথার কোন দামই নাই।

ভবদেববাবু কোনদিনই নিজের জন্য কিছু করেননি। তাহলে সেই সময় থেকে স্কুলের পিছনে পড়ে থাকতেন না। গ্রামের অনেক সহপাঠীই এখন অবস্থা বদলে ফেলেছে।

তার সঙ্গে পড়তো মধু সেন, রমেশ মুখুজ্যে ওরা তার চেয়েও নিরেট ছাত্র ছিল। পড়াশোনাতে তেমন মাথাও ছিল না। গোবর্দ্ধন পান ফি বছর ক্লাসে গড়ান দিত। তারা এখন বেশ উন্নতি করেছে।

মধু সেন এখন সদরের নামী উকিল। সদরেই বিরাট বাড়ি গাড়ি করে ঠাটে-বাটে রয়েছে। মাঝে মাঝে গাড়ি হাঁকিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসে। কথাও হয়।

রমেশ মুখুজ্যে কলকাতায় এখন লোহার ব্যবসায়ী। কোনমতে টেনেটুনে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে রমেশ। আর কলেজে পড়ার মত আর্থিক অবস্থা তার ছিল না।

তার কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয় কলকাতায় থাকে। তার বাসায় গিয়ে জুটেছিল। তার ফাই-ফরমাস খাটতো আর দুপুরে কোনও দোকানে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল।

সেই রমেশ এখন বিরাট লোহার ব্যবসায়ী। কী সব কারখানাও করেছে।

আর গোবর্দ্ধন পান অবশ্য গ্রামেই রয়েছে। সে ম্যাট্রিকের বেড়াটা কয়েক বছর চেষ্টা করেও পার হতে না পেরে বাপের কানমলা খেয়ে ওই পড়াশোনার জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে বাবার মুদিখানার দোকানেই বসলো।

ধান চাল কেনাবেচা করে গোবর্দ্ধন। ক্রমশ ওই ধান থেকে গোবর্দ্ধন কী করে মা লক্ষ্মীকে বন্দী করে ফেললো তা কারো জানা নেই — এখন গোবর্দ্ধন পান বিশাল ধানকল বানিয়েছে, ট্রাকও রয়েছে কখানা।

এলাকায় এখন চাষের রূপও বদলে গেছে। বছরে এখন ক্যানেলের জলে বিস্তীর্ণ এলাকায় দু'বার ধান হয়। আর আগেকার মত আকাশের দিকে বৃষ্টির আশায় চেয়ে থাকতে হয় না।

ক্যানেলের জলে ধান-আলু-সরষে সবই হয়। তাই সারের দরকার। গোবর্দ্ধন পান সারের বড় এজেন্ট। সার, পাম্প, ডিপ টিউবয়েল, শ্যালো — মায় ট্রাকটার অবধি বেচে সে। এখন গোবর্দ্ধন পান এদিকের একজন নামী লোক।

এখন সেইই স্কুলের প্রেসিডেন্ট, আর সেক্রেটারি হয়েছে বিপিন ঘোষ।

বিপিন পাশের নশীপুরের লোক। কোনমতে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়তে যায়। সেখানেই ক্রমশ ছাত্র নেতা হয়ে পড়ে। অবশ্য বিপিনের বাবা ছিল এখানের জমিদার নিত্যবাবুদের গোমস্তা।

নিত্যবাবুদের জমিদারী এককালে বেশি বড় না হোক — তবুও ভালোই ছিল। আয়পয়ও কম ছিল না। বিপিনের পিতৃদেব নরেশ গোমস্তাই এসব দেখভাল করতো। নিত্যবাবুর ছেলে ইনজিনিয়ার, বাইরে থাকে।

সে বলতো— বাবা, এবার দিন বদলাবে। আর জমিদারী চালিয়ে বসে খাবার দিন থাকবে না। তাই আগে থেকেই খেটে খাওয়াটা অভ্যাস করে নিই। তুমিও এবার জমি ক্রমশঃ বিক্রী করে দাও। শালবনও বিক্রি করে যা নগদ পাও নিয়ে নাও। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। এসব আর থাকবে না।

নিত্যবাবু ছেলের কথাটা মানতেই চান না। ছেলে বিকাশ-এর ব্যাপারগুলো তাঁর ভালো লাগে না। বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে ইনজিনিয়ারিং পড়ে। বাবা বলেন,— এসব জমিদারী কে দেখবে? বংশের কেউ চাকরি করেনি। তুই চাকরি করতে যাবি। গোলামি করবি এই বংশের ছেলে হয়ে?

বিকাশ বলে,— বাবা। গোলামি না করে ব্যবসাও তো করতে পারি। তার জন্যই না হয় এটা শিখলাম। আর জমিদার সেজে থাকার দিন ফুরিয়ে আসছে।

নিত্যবাবু চুপ করে থাকেন।

ভবদেব মাঝে মাঝে ওর কাছে যায়। ওই স্কুলের জন্য নিত্যবাবুই তিরিশ বিঘে জায়গা দান করেছেন। সেটা এখন আর কেউ স্বীকার না করলেও ভবদেব করেন।

নিত্যবাবু বলেন— শুনলে ভব ছেলের কথা। আর এত চেষ্টা করে দেশ স্বাধীন করলাম, বলে কিনা আমাদেরই সব কেড়ে নেবে? জমিদারী চলে যাবে? এত শালবন তাও!

ভবদেব অবশ্য কলকাতায় মাঝে মাঝে যাতায়াত করে। অবশ্য আগে যাতায়াত করতো স্কুলের কাজে। এখন স্কুলের কাজ দেখেন তার চেয়ে অনেক বড় তকমাধারী হেড মাস্টার নীলু বাবু, সহকারী হেড মাস্টাররা। বোর্ড-সদরে তাদেরই চেনাজানা অনেকে রয়েছে। এখন হাজার হাজার টাকা আসছে, নতুন বিলডিং ফান্ডে আড়াই লাখ টাকা এসেছে। আর তাদের তখন স্কুলের ঘর ছাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে চাষীদের বাড়িতে খড় চেয়ে এনে ঘর ছাইতেন।

ছোট বিলডিং-এর জন্য ভিক্ষাই করেছেন। আর মাইনে? সামান্য যে টাকা জুটতো — তাই চারজন শিক্ষক ভাগ করে নিয়ে দিনভোর ছাত্রদের পড়াতেন।

এখন সেখানে সরকারই মাইনে দেয়। বিলডিং-এর জন্য টাকা দেয়। অবশ্য বিপিন ঘোষ-এর জীর্ণ খড়ের বাড়িও কোন অদৃশ্যপথে দোতলা দালানে পরিণত হয়েছে।

ভবদেব নিত্যবাবুর কথায় বলে— ঠিক বড়বাবু, দিনকাল বদলাচ্ছে। কলকাতায় শুনি এসব কথাত উঠেছে। জমিদারীই নয় — আওয়াজ উঠছে লাঙ্গল যার জমি তার। এখানে দেখছেন না একটা কেমন হাওয়া বদলের ভাব আসছে। সেটাও বোঝা যায়।

সমাজব্যবস্থায় একটা রদবদল আসছে। যে মানুষগুলো এতদিন মুখ বুজে ছিল তাদের নিয়েই এবার একদল বেসাতি শুরু করেছে।

বিপিন ঘোষ-এর মত এক শ্রেণীর মানুষ গজিয়ে উঠছে। যারা সমাজের অধিকাংশ মানুষের দুর্বলতার খোঁজ জেনে নিয়ে সেই ক্ষোভকে নিয়েই নিজেদের আখের গড়ে তুলতে চায়।

নিত্যবাবু বলে— ওই নরু গোমস্তার ব্যাটা শুনি কি সব আন্দোলনও শুরু করেছে।

নরেশ গোমস্তাও বসে নেই। সেই খবরটা জেনেছে, এতদিনের জমিদারী প্রথা এবার চৌপট হতে চলেছে। নিত্যবাবুও খবরটা শুনে চমকে ওঠে।

এ যেন বিশ্বাসই করতে পারে না সে। বলে,

— ঠিক শুনেছো নরু?

নরু বলে— আইন পাশ হয়ে গেছে। মধ্যস্বত্ব লোপ আইন। জমিদার আর খাজনা আদায় করতে পারবে না। প্রজা সোজা সরকারকেই খাজনা দেবে। সব জমি সরকারের। আর মধ্যস্বত্বের ধানও কেউ পাবে না। অবশ্য সরকার জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেবে।

নিত্যবাবু জানে কী পাবে। এর আগেই সরকার এক কলমের খোঁচায় তার পাঁচ হাজার বিঘে শালবনই নিয়ে নিয়েছে। শুধু তারই নয় — সমস্ত শালবন এখন সরকারের।

তখন বিস্তীর্ণ শাল মহুয়া কেঁদ এসবের ঘন অরণ্যভূমি ছিল চারদিকেই। সেই বনে চিতা-নেকড়ে-ভালুক-বনশুয়োর-ময়ূর এসবও থাকতো। জমিদার বা বন মালিকরাই সে সব বিস্তীর্ণ বনের রক্ষণাবেক্ষণ করতো।

বন কিছু কিছু কাটাই করতো তারা। শালগাছ বিক্রিও করতো। কিন্তু তাও হতো হিসাব করে যাতে বনভূমি ওই সম্পত্তি বজায় থাকে। তাই বনও ছিল গভীর।

কিন্তু বন সরকারের হাতে যাবার পর শুরু হলো বনে যথেচ্ছ লুটপাট। একদল লোক তখন থেকেই সমাজের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিজেরাই তুলে নিয়েছে!

ভোট দিয়ে নেতা তৈরি করা হয়েছে — তারাই দেশকে শাসন করবে। ইংরেজ চলে গেছে। তারাই হবে দেশের রক্ষক।

কিন্তু ভোটে জেতার পর তাদেরই অধিকাংশ হয়ে গেছে রক্ষক নয় — হতে শুরু করলেন ভক্ষক। তাদের যারা ভোটে জয়ী করেছিল গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে, সেই দলও এবার গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হয়ে উঠে ক্রমশ জমিদারদের শূন্যস্থানটা দখল করার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

বন গেল— এবার গেল জমিদারী বিলুপ্ত হলো মধ্যস্বত্ব প্রথা। এইবার ভবদেব বাবুদের মতো অনেকেই বিপদে পড়ে। এতকাল নিজেদের জমির আয় ছাড়াও ভবদেববাবু বছরে দেড়শ মণ ধান পেতেন আশপাশের বেশ কিছু মৌজার চাষীদের কাছ থেকে। এখন থেকে সেই ধানও আর পাবেন না।

কিছু শালবন ছিল তার। শ চারেক বিঘার মত শালবন। ওখানের বনে তার ঠাকুর্দার আমল থেকেই শ দু-তিন শালগাছ রাখা ছিল। সত্তর-আশি বছরের শাল গাছগুলো — বিশাল গুড়ি তাদের, — আকাশে ঠেলে উঠেছে গাছগুলো। এর মধ্যে ছ'ফিট-এর মত বেড় হয়েছে গুঁড়ির। এর বাজার দরও লাখ খানেক টাকা।

আর বাকী বনের ছোট মাঝারি শাল গাছ বছরে কিছু জ্বালানী হিসাবে বিক্রি হতো — নিজেদের কাজেও লাগতো।

ভবদেববাবু বলেন— সুলোচনা, শাল বন সব নিয়ে নিল সরকার। একপয়সাও ক্ষতিপূরণ দিল না।

সুলোচনাও দেখেছে ব্যাপারটা। বলে সে— একা তোমারই যায়নি। এত লোকেরই শালবন সব চলে গেল। নিত্যবাবুরই তো পাঁচহাজার বিঘের বন সরকার নিয়ে নিল — অন্যদের আরও বেশী ছিল। সব এখন সরকারের সম্পত্তি হয়ে গেল। দুঃখ করে কি হবে।

ভবদেবের ছোট ছেলে রতন, এখন উচ্চমাধ্যমিক দিচ্ছে। আর তারপরে একটি মেয়ে — মাধুরী, সে এখন ক্লাশ নাইনে পড়ছে।

ভবদেবের বড় ছেলে কাঞ্চন পড়াশোনায় ভালোই ছিল। অনার্স নিয়ে বি.কম. পাশ করে কলকাতায় এম.কম করে, ভবদেববাবুর ইচ্ছা ছিল কাঞ্চন শিক্ষকতা করুক।

কিন্তু কাঞ্চন বলে— ওই করে নিজের জীবনটাকে তুমি বরবাদ করেছো বাবা।

— মানে! কী বলছিস তুই কাঞ্চন?

কাঞ্চন বলে— নয়তো কি? তখন চাকরী, না হয় বি.এল পাশ করে ওকালতি করলে আজ তোমাকে গ্রামে এই সহকারী শিক্ষক হয়ে পড়ে থাকতে হতো না। সহরে নামী লোকই হতে। গাড়ি-বাড়ি সবই হতো।

ভবদেব ছেলের কথায় অবাক হন। তার শিক্ষা যে ব্যর্থ হয়েছে কোনখানে সেটা আজকের সমাজকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে। স্বাধীন হয়েছে দেশ, কলকারখানা গড়ে উঠছে — কৃষি বিপ্লবও হচ্ছে। কিন্তু মানুষ গড়ার চেষ্টাই হয়নি। তাই হঠাৎ পাওয়া সব কিছুকে দেখে সে অসংযত মানুষগুলোর মনের হতাশার ক্ষোভটাই বড় হয়ে উঠেছে।